অকপট

সুশীল চৌধুরী

পুনশ্চ

মুখবন্ধ

আমার ছোটোবেলার নানা দুরন্তপনা আর জীবনের নানা চড়াই উৎরাই-এর গল্প শুনতে ভালবাসে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। পরে নাতিনাতনিরাও। তাদের উৎসাহ এবং তাগাদাতেই কলম ধরতে হল এ লেখার জন্য। দেশে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো, নিজের গবেষণার কাজকর্ম, ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার তত্ত্বাবধান ইত্যাদি করতে গিয়ে আমার জীবনালেখ্য লেখার কাজ আর হয়ে উঠত না। ২০০২-এর গ্রীষ্মবকাশে আমেরিকার ডার্টমুথ কলেজে গিয়েছিলাম কন্যা-জামাতার কাছে, তারা তখন ওখানে পড়ায়। সেখানে 'জয়দুর্গা' বলে শুরু করি এই আত্মকথন লেখা। তারপর থেকে শুধু বাইরে গেলেই লেখাটা কিছুটা এগোয়। শেষ পর্যন্ত ২০০৯ নাগাদ প্রথম খসড়া শেষ করি। তারপর এক বছর কিছুদিন এতটাই কাজ করে পাণ্ডুলিপিটির ঘষামাজা শেষ করি। তাই মূলত ২০০৮ পর্যন্ত ঘটনাক্রমই এখানে বিবৃত।

ছোটোবেলার বর্মা মুলুকের অভিযানের স্মৃতি খুব একটা স্পষ্ট নয়—ভাসা ভাসা। তবে চট্টগ্রামে কাটানো শৈশব কৈশোরের কথা প্রায় সবটাই মনে আছে। যুদ্ধের দামামা, বোমাতঙ্ক থেকে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া আর দাঙ্গার পদধ্বনি নিতান্ত বালকের মনে কিছুটা ছাপ ফেললেও তেমন গভীরভাবে কোনো দাগ কাটতে পারেনি কারণ পাড়ায়-পাড়ায়, বনে বাদাড়ে দস্যিপনায় কেটে যেত অনেকটা সময়ই, কলকাতায় এসে। সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ। এখানকার হালচাল, কথ্যভাষা, ধরনধারণে বিস্মিত কিশোর আস্তে আস্তে কিছুটা ধাতস্থ হয়। এখানে স্কুলে ভরতি হওয়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় এবং সাফল্যে কিশোর হঠাৎ যেন বড়ো হতে শুরু করে। সেই বড়ো হওয়া চলতে থাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় পর্যন্ত।

তারপর ত কর্মজীবন, নানা ঘাতপ্রতিঘাত, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে জীবন সায়াহ্নে উপস্থিত। জীবনটা সফল বা ব্যর্থ তার হিসেব নিকেশ করাটা এখন অবাস্তব। তবে এটুকু বলব, পেয়েছি অনেক আশাতীতভাবেই। দেশ-বিদেশে হয়েছে নানা অভিজ্ঞতা—কখনও মধুর, কখনও বা তিক্ত। মিশেছি বহুরকমের মানুষের সঙ্গে—দেখেছি মানুষ কত মহান, আবার কত ছোটোও হতে পারে। ভালোমন্দ নিয়েই ত এই পৃথিবী। তবে যা দেখেছি, যা জেনেছি, যা অভিজ্ঞতা হয়েছে—সবটাই বলেছি একেবারে খোলাখুলি, এতটুকু রাখঢাক না রেখে। তাই এটা 'অকপট' আত্মকথন। যে সব মানুষের কথা এখানে আলোচিত, তাঁদের কেউ কেউ এখন প্রয়াত—এটা বড়ো বেদনার। এ আত্মকথায় অনেক সরস গল্পকথার

সঙ্গে কিছু অপ্রিয় সত্য উঠে এসেছে—সত্যনিষ্ঠার স্বার্থে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও। তবু যদি অজান্তে কারও মনে আঘাত দিয়ে থাকি তার জন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চার দশকের বেশি অধ্যাপনা করার ফলে শিক্ষাজগতের অনেক কিছু দেখেছি, জেনেছি। রাজনীতির অলিন্দের নানা নেপথ্য কাহিনিও কিছুটা জেনেছি নানাভাবে, সেইসব উন্মোচিত এই স্মৃতিকথায়।

আমার পুত্র শিলাদিত্য (রাজ) তার 'পিকাসা' ছবির আর্কাইভ থেকে অনেক ছবি খুঁজে বার করে দিয়ে আমার অনেক পরিশ্রম লাঘব করেছে। ইষ্টার্ণ ফিনান্স লিমিটেডের অভিষেক আগরওয়ালের সৌজন্যে প্রবীর গাঙ্গুলি অনেক ছবি বইতে ছাপাবার জন্য যাঁরা ছবি দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ— বিশেষ করে নির্মলা ব্যানার্জী, উমা দাশগুপ্ত, নারায়নী গুপ্ত, প্রমুখ। শ্রীবাদল বসু আমার পাণ্ডুলিপিটি আগ্রহভরে পড়েছেন—তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পুনশ্চ'র অধিকর্তা সন্দীপ নায়ক অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বইটি প্রকাশনার ব্যবস্থা করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পরশে আবদ্ধ করেছেন। আমার স্ত্রী মহাশ্বেতার অকুণ্ঠ সাহায্য ছাড়া আমার লেখা অন্য বইগুলোর মত এ বইটিও লেখা সম্ভব হত না। আমাদের অর্ধশতাব্দীর বেশি দাম্পত্যজীবনে এখন তাঁকে নতুন করে ধন্যবাদ জানানোর প্রচেষ্টা নেহাতই বাতুলতা।

জানুয়ারি ২০১৪ সুশীল চৌধুরী

সূচিপত্র

ছোটোবেলা — বর্মা মুলুক, চট্টগ্রাম	১৭
কলকাতা পর্বের শুরু : বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল	৪৫
কলেজ জীবন — প্রেসিডেন্সি, রামকৃষ্ণ মিশন হস্টেল, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	৬১
আবার কলেজ — দিল্লি, বুলগানিন, ক্রুশ্চেভ, ইটনা-মৈমনসিংহ	৭৩
বিশ্ববিদ্যালয় : শিক্ষকতার শুরু	৯১
প্রণয় ও পরিণয়পর্ব	১০৪
নরেন্দ্রপুর, বিশ্ববিদ্যালয়, বিদেশ যাত্রা	১১৬
লন্ডন প্রবাসে : তথ্যের সন্ধানে হল্যান্ড	১২৪
ইউরোপের কন্টিনেন্ট : আবার লন্ডন, পড়াশুনো	১৫১
আবার বিদেশ	২০৩
পার্টির কুক্ষিগত বিশ্ববিদ্যালয় : সন্তোষ ভট্টাচার্য, নুরুল হাসান প্রসঙ্গ	২১৪
বাসস্থানের সংস্থান	২৩০
দেশ বিদেশে অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে	২৩৯
ওয়ার্লড ইকনমিক হিস্ট্রি কংগ্রেসের দৌলতে	২৮৫
দেশবিদেশের টুকিটাকি	৩১৮
রাজনীতির অলিন্দে	৩২৭
জীবন সায়াহ্ন : চাওয়া পাওয়ার হিসেব নিকেশ	৩৪১

ছোটোবেলা—বর্মা মুলুক, চট্টগ্রাম

ছোটোবেলার সোনালি দিনগুলি অনেকদিনই পেরিয়ে এসেছি। তার স্মৃতিও এখন কিছুটা অস্পষ্ট। তবু কখনো কখনো তা এখনও মনে পড়ে। আসলে স্মৃতিতো সততই সুখের। কষ্টের কথা স্বাভাবিকভাবেই ভুলে যাই আমরা, হয়তো ভুলতে চাই বলেই। তবে কিছু কিছু সোনালি স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল—তাই দিয়ে কিছু ছবি আঁকার চেষ্টা করেছি এখানে।

সফল মানুষরা পেছনের চেয়ে সামনেই তাকায় বেশি। কিন্তু আমার মতো সাধারণ মানুষ ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি রোমন্থন করে আনন্দ পায়, যদিও তা হয়তো সব সময় নির্ভেজাল সুখের ছিল না। কাগজ কলমে জন্ম আমার চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এক গ্রামে। নাম তার সুলতানপুর। তবে সেখানে কোনো সুলতান কোনোদিন থাকত বলে শুনিনি। একেবারে ছোটোবেলার স্মৃতিতে যা আছে তা কিন্তু ওই গ্রাম নয়— বর্মা মুলুকের ছোট্ট বন্দর শহর আকিয়াব। মনে হয় আমার জন্ম আকিয়াবেই, ওখানেই তো আমাদের বাড়ি ছিল পঁচিশ বছরের ওপর। পাসপোর্ট করার সময় ঝামেলা যাতে না হয়, তার জন্য হয়তো জন্মস্থান সুলতানপুর লেখা হয়েছিল। এখন আমার চেয়ে বড়ো এমন কেউ নেই যিনি সঠিক বলতে পারবেন। অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না, চট্টগ্রাম আর আকিয়াব তো পাশাপাশিই। আমার বাবা আকিয়াবে ব্রিটিশ কাস্টমসে কাজ করতেন, বাড়িও করেছিলেন ওখানেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি বোমার ভয়ে বর্মা ছাড়ার আগে পর্যন্ত বাবা প্রায় তিরিশ বছর ওখানে চাকরি করেছেন।

আমাদের বাড়ি ছিল ছোট্ট কিন্তু বেশ সুন্দর। বাবা মনে হয় সাধারণ চাকরিই করতেন, তেমন কোনো উঁচুপদে নয়। তবে যেটুকু মনে পড়ে আমরা কয়েক ভাইবোন বেশ সুখে আর আনন্দেই ছিলাম। ওখানেই আমার প্রথম স্কুল-সম্ভবত আরাকান অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুল। হেঁটেই স্কুলে যেতাম— কাছেই ছিল। স্কুলের মাঠে খেলতামও এবং অবশ্যই ফুটবল। আকিয়াবের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল ভিউ পয়েন্ট, আমরা বলতাম শুধু 'পয়েন্ট'। এখানে কালাদান নদী এসে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। তাই এই 'পয়েন্টে' দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

মাঝে মাঝেই আমরা ভাইবোনরা বা বন্ধুবান্ধবরা মিলে চলে যেতাম 'পয়েন্টে'। তখনও বঙ্গোপসাগরের নাম জানতাম না, শুধু জানতাম সমুদ্র, সেই সমুদ্রের বিরাট বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়তো 'পয়েন্টে' আর অনেক সময় তা আমাদের জামাকাপড় ভিজিয়ে দিত। তাতেই ছিল আমাদের আনন্দ আর মজা। আর মাঝে মাঝে যেতাম ফুটবল খেলা দেখতে, গ্যালারিতে বসে দেখতাম খেলা, সঙ্গে চলত বাদাম ভাজা খাওয়া।

এমনি করেই চলছিল। হঠাৎ একদিন শোনা গেল যুদ্ধ লেগেছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জাপানিরা যে-কোনোদিন আকিয়াব আক্রমণ করতে পারে। যুদ্ধ কী জিনিস তা বোঝার মতো বয়স বা বুদ্ধি কোনোটাই তখন আমার হয়নি। একদিন শুধু আকাশে অনেক প্লেন দেখা গেল— অনেকটা নীচু দিয়ে সেগুলি আসছিল। তার আগে আকাশে প্লেনই দেখা যেত না— দেখিওনি কোনোদিন। ওই প্লেনগুলি আকাশে কয়েকবার চক্কর দেওয়ার পর চলে গেল, শুনলাম ওগুলো জাপানি প্লেন। তার কয়েকদিন পর আমাদের বাড়ির সামনে মাটি খুঁড়ে একটা গর্তমতো তৈরি করা হল। তার ওপরে কী সব দিয়ে ঢাকাও দেওয়া হল। এগুলো যে ট্রেঞ্চ, তাও তখন জানতাম না। শুধু এটুকু শুনেছিলাম যে জাপানি প্লেন এলেই ওই গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে। কেন, তাও বোধগম্য হয়নি। একটু একটু মনে আছে, দাদা মেজদারা বলেছিল জাপানিরা বোমা ফেলতে পারে— তখন ওই গর্তে আশ্রয় নিতে হবে। প্রথম যেদিন জাপানি প্লেন এসেছিল, তারা নাকি শুধু দেখে গেছে।

বোমা কী জিনিস ছোটো এই সরল শিশু কী করে বুঝবে? তাই বোমা ফেলা দেখার জন্য এবং তাতে কী হয় তা জানবার জন্য অসীম এক কৌতূহল হয়েছিল। দিন সাতেক পর আবার একদিন আকাশে জাপানি প্লেন দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বাজল। আমরা সবাই দৌড়ে ট্রেঞ্চে ঢুকে পড়লাম। অধীর আগ্রহে বোমা পড়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম— ভয়ডর তো নেই, বোমা কী জিনিস তাই তো জানিনা, তাই ভয়ের প্রশ্নই ছিল না। আকাশে প্লেনের গর্জন শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল খুব কাছে থেকে। সম্ভবত খুব নীচু দিয়ে যাচ্ছিল বলে। দু'একবার ট্রেঞ্চের ঢাকা একটু তুলে দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম, বড়োদের ধমকে তা সম্ভব হল না। মিনিট পনেরো পরে প্লেনের গর্জন বন্ধ হয়ে গেল— তারও কিছুক্ষণ পরে সাইরেন বেজে উঠল। আমরাও সবাই ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এলাম। বড়োরা সবাই খুব স্বস্তি পেল। আমি কিন্তু খুবই হতাশ হলাম— বোমাও পড়ল না, বোমা ফাটলওনা। বোমা পড়লে বা কাছাকাছি ফাটলে কী যে পরিণাম হয়, তা বোঝার ক্ষমতা ভাগ্যিস ছিল না।

পরে শুনেছিলাম, জাপানিরা নাকি শুধু দেখে যাচ্ছিল কী রকম অবস্থা আর মানুষকে কিছুটা ভয় পাইয়ে দিতে আসছিল। অনেকেই তখন, বিশেষ করে বাঙালিরা, ভারতীয়দের মধ্যে তারাই বেশি, দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করল। বাবার সরকারি চাকরি— সুতরাং এত সহজে বর্মা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ এদিকে সবার মধ্যে জাপানি বোমার আতঙ্ক— আমাদের নিরাপত্তার প্রশ্ন। তাই ঠিক হল বাবা, মা, দাদা (দাদা তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে (বর্মা মুলুক তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায়) আকিয়াবে থাকবে, বাকিদের— মেজদা, সেজদা, আমি আর বোন পুতুল— কাকার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কাকা আকিয়াব থেকে কিছুটা দূরে রাসিদং বলে একটা জায়গায় সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার।

কাকার সুন্দর কাঠের বাংলো— মাটি থেকে কিছুটা ওপরে কাঠের থামের ওপর। ডাক্তার বলে গ্রামে কাকার খুব সম্মান, ফলে আমাদেরও বেশ কিছুটা খাতির। গ্রামের সাধারণ বর্মি

মানুষ কাকাকে প্রায় ভগবানতুল্য জ্ঞান করত। প্রায়ই এসব গরিব মানুষরা ফলমূল নিয়ে আসত—তাদের আত্মীয়স্বজনকে কাকা সুস্থ করে তুলেছেন এই সুবাদে। এক আধবার এমনও হয়েছে যে, কোনো রুগী মারা গেলে তার নিকট আত্মীয়রা কাকার বাংলোর নীচে এসে অঝোরে কাঁদতে থাকত, কাকা যদি মৃতকে বাঁচিয়ে দেন, যেন ইচ্ছে করলেই কাকা তা করতে পারবেন। এদের এমন সরল বিশ্বাস দেখে সেই ছোট্টবেলায়ও অবাক হয়ে যেতাম।

কাকার ওখানে বেশ ভালোই কাটছিল, স্কুল নেই পড়াশুনোও না। মহানন্দে দুষ্টুমি করা যেত— বন বাদাড়ে এদিক ওদিক চষে বেড়ানো যেত খুব। ঘুরে বেড়াতাম হাটে বাজারে, নদীর ধারে, কখনো বা প্যাগোডাতে। ভর দুপুরে বা রাত্রে ক্যারাম খেলতাম, মাঝে মাঝে তাস। কাকিমার খুব তাসের নেশা, তাই সময় পেলেই আমাদের নিয়ে বসতেন তাসে। তবে এ সুখ কপালে বেশিদিন সইল না। মাস দেড় দুই পরে আমাদের আকিয়াবে ফিরে আসতে হল। এবার আমাদের বর্মাবাসের পাট চুকোতে হবে। তদ্দিনে জাপানিরা বর্মায় ঢুকে রেঙ্গুনের দিকে এগিয়ে আসছে— তাই আকিয়াবও আর নিরাপদ নয়। অনেক বাঙালিই দেশে ফিরে যাচ্ছে, আমাদেরও ফিরতে হবে। তবে বাবা যেহেতু সরকারি কর্মচারি, আমাদের ফিরিয়ে আনাটা সরকারেরই দায়িত্ব। সিভিলিয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট জাহাজে আমাদের জায়গা হল, সরকারি কর্মচারিদের পরিবারদের নিয়ে যাওয়ার জন্য সেটিই শেষ জাহাজ। কর্মচারিদের কিন্তু থেকে যেতে হল। বাবা ফিরলেন—একেবারে শেষ জাহাজে— ইংরেজরা যখন বর্মা ছেড়ে একেবারে বিদায় নিতে বাধ্য হল।

এই প্রথমবার আমরা ছিন্নমূল হলাম। দ্বিতীয়বার, দেশভাগের পর, সে প্রসঙ্গ যথাসময়ে। আকিয়াবে বাবার প্রায় তিরিশ বছরের বাস। সেই বাড়ি ঘরদোর সব ছেড়ে আমাদের চট্টগ্রামে চলে আসতে হল। বাবা সরকারি চাকুরে, তাই তেমন কিছু ধনদৌলত আমাদের ছিল না। তাহলেও ফিরতে হল প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায়। ইচ্ছে করলে কাস্টমস হাউসে চাকরি করে বাবা হয়তো ভালোই পয়সা করতে পারতেন। আমার এক খুড়তুতো কাকাকে বাবা কাস্টমস হাউসে চাকরিতে ঢুকিয়েছিলেন— তখনকার দিনে ইংরেজ সাহেবকে বলে এরকম করা যেত। তাছাড়া মনে হয় বাবা হয়তো হেড ক্লার্ক ছিলেন, তাই সাহেব বাবার অনুরোধ রেখেছিলেন। বাবাকে আমার মামীমারা ডাকতেন 'বড়ো কেরানি' বলে— তা থেকে মনে হয় বাবা হয়তো হেড ক্লার্কই ছিলেন। যাহোক, আমার ওই কাকা কিন্তু বেশ 'টু-পাইস' কামিয়ে নিয়েছিলেন— তা দিয়ে দেশে বেশ কিছুটা জমি জমাও কিনেছিলেন এবং দেশে ফেরার সময় বেশ কিছু টাকাকড়িও নিয়ে এসেছিলেন। তিনি আমাদের বলতেন, 'তোর বাবা এত বোকা, কত পয়সা করতে পারতেন, কিছুই করলেন না। অত সাধু হলে চলে?'

সাধু কিনা জানি না। তবে ছোটোবেলার একটা ঘটনার কথা একটু একটু মনে পড়ে। বড়ো হয়ে অবশ্য মার কাছেও ব্যাপারটা শুনেছি। একদিন এক ভদ্রলোক বেশ বড়ো একটা মাছ দিয়ে গেলেন। মা ভাবলেন বাবা মাঝে মাঝে অফিস থেকে বেরিয়ে মাছ কিনে পাঠিয়ে দেন, এটাও তাই। রাত্রে সবাই খেতে বসেছি, বেশ বড়ো বড়ো মাছের টুকরো দেখে খুব

লোভ হচ্ছে— সাধারণত এত বড়ো মাছ তো আর বাড়িতে আসত না। বাবার পাতে মাছ পড়ল। মাছের টুকরো দেখে বাবা বুঝলেন বড়ো সাইজের মাছ। মাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ মাছ কোত্থেকে এল। মা বললেন, একজন দিয়ে গেছে, ভাবলাম তুমি পাঠিয়েছ। বাবা সঙ্গে সঙ্গে থালা সুদ্ধ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন। মাকে খুব বকাবকি করলেন। কেন মা ওই মাছ নিলেন। আমাদেরও আর অত ভালো মাছ খাওয়া হল না, সবই ফেলে দেওয়া হল। পরে শুনেছি ওখানকারই এক ব্যবসায়ীর কী জিনিস জাহাজে এসেছিল, তিনি কোনো কারণে সে খবরই পাননি। মালগুলো খালাস করতে দেরি হলে ডেমারেজ তো লাগবেই, মালগুলোও তো নষ্ট হয়ে যেত। বাবা ভদ্রলোককে খবর পাঠিয়েছিলেন তিনি যেন মালগুলো খালাস করে নেন। তাই তিনি কৃতজ্ঞতা বশত একটা মাছ কিনে চুপি চুপি বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন— জানতেন বাবা কিছুতে নেবেন না। পরে বড়ো হয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছি কেন এমন করেছিলেন। বাবার উত্তর, একবার কারো কাছ থেকে কিছু নিলে এটা চাওর হয়ে যাবে। তখন সবাই চেষ্টা করবে এরকম 'ঘুষ' দিয়ে আমার কাছ থেকে অন্যায় সুবিধে আদায় করতে।

আকিয়াব থেকে ফেরার পথে জীবনে প্রথম সমুদ্রপথে জাহাজ চড়ার অভিজ্ঞতার কথা ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ে। স্মৃতিতে যেটুকু ভাসে তা হল গাদাগাদি ভিড়, কোথাও বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। বেশির ভাগ যাত্রীকেই ডেকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, আমাদেরও একই অবস্থা। জাহাজের দোলায়, নোনা হাওয়ায় অনেকেই বমি করছিল, অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। আমি মোটেই পালোয়ান ছিলাম না, বেশ দুবলাই ছিলাম। তা সত্ত্বেও আমার কিন্তু একবারও বমি হয়নি, যদিও অন্য ভাইবোনরা বমির হাত থেকে রেহাই পায়নি। জাহাজে খাওয়াদাওয়ার বিশেষ কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। প্রায় সবাইকেই সঙ্গে আনা চিঁড়েমুড়ির ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। আসলে সিভিলিয়ানদের জন্য এটাই শেষ জাহাজ বলে গাদাগাদি ভিড়, অব্যবস্থার চূড়ান্ত কারণ ব্রিটিশরাও তখন বর্মা ছেড়ে আসার তোড়জোড় করছে, এদিকে নজর দেওয়ার সময় কোথায়! তাই সরকারি কর্মচারির পরিবারের লোক হয়েও আমাদের অন্যদের মতোই দুর্ভোগে পড়তে হল।

তবে এ জাহাজ যাত্রায় আমাদের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। জাহাজ আকিয়াব ছাড়ার কিছুক্ষণ পরে, বোধহয় ঘণ্টাখানেক, হঠাৎ বেশ কয়েকটা প্লেন জাহাজটাকে প্রায় ঘিরে ফেলে আর বার বার অনেকটা নীচে নেবে এসে জাহাজটাকে চক্কর দিতে থাকে। বোঝা গেল ওগুলো জাপানি প্লেন। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব, অনেকেই কান্না জুড়ে দিয়েছে। আমি কোনো দিনই বীরপুরুষ ছিলাম না— পরে রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' পড়ে এবং আবৃত্তি করতে গিয়ে খুব অবাক হয়ে যেতাম, আমি তো ওই বয়সে ওরকম কল্পনাই করতে পারতাম না। যাহোক, জাপানিদের প্লেন শুনে আমারও আত্মারাম খাঁচাছাড়া, ভয়ে হাত পা ঠান্ডা। প্রায় আধ ঘণ্টা এ অবস্থায় কাটার পর প্লেনগুলো ফিরে গেল যখন বুঝল যে জাহাজে সিভিলিয়ানরাই শুধু আছে, মিলিটারি কিছু নেই। বাবা ফিরলেন, ইংরেজরা রেঙ্গুন

ছাড়ার পরই, ১৯৪২ সালের প্রথমদিকে যখন আকিয়াব থেকে সরকারি কর্মচারিদের জন্য শেষ যে জাহাজ চট্টগ্রাম এল, তাতে করে। তিন কাকা ফিরলেন— আলাদা আলাদা ভাবে— শুনেছি মাসখানেকের বেশি পায়ে হেঁটে। সে নাকি অসহ্য যন্ত্রণা আর কষ্টের ব্যাপার। হাজার হাজার লোক বর্মা থেকে ফিরছে পায়ে হেঁটে— রাস্তায় খাবার নেই, আশ্রয় নেই এমন কি খাবার জলেরও অভাব। তার ওপর বর্মি চোর ডাকাতের উৎপাত চারদিকে। এমনও দৃশ্য নাকি দেখা গেছে— স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে খাবার কেড়ে নিচ্ছে, বাবা মা বাচ্চার হাত থেকে— মানুষ তখন অমানুষ। তার ওপর আছে জ্বরজারি, পেটের অসুখ আর নানারকমের অসুখবিসুখ। ফলে রাস্তার ধারে ধারে মৃতদেহ পড়ে আছে। ভাগ্যিস আমাদের এসব দেখতে হয়নি। কাকাদের কাছে সব বর্ণনা শুনতে শুনতে শিউরে উঠতাম ঐ ছেলেবেলায়ও।

এত গেল যার। হেঁটে ফিরে আসতে পেরেছিল। যারা পারেনি তাদের কারো কারো কী অবস্থা হয়েছিল তাও শুনেছিলাম একজন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে— তিনি আমাদের একজন আত্মীয়। তখন অনেকটা বড়ো হয়েছি— তাও সে ভদ্রলোকের নিদারুণ অভিজ্ঞতার করুণ কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম। উনি কোনও কারণে জাপানিরা আসার আগে বর্মা ছাড়তে পারেননি, ফলে তাদের হাতে বন্দি হন। জাপানি বন্দিশালায় বীভৎস অত্যাচারের কিছুটা চিত্র পাওয়া যায় ইংরেজি সিনেমা 'ব্রিজ অন দ্য বিভার কোয়াই'-এ। আমার আত্মীয় ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতা তার চেয়ে কিছু কম নয়। বছর তিনেক তিনি জাপানিদের হাতে বন্দি ছিলেন। তখন যত রকমের আজেবাজে কাজ—টয়লেট পরিষ্কার করা থেকে রোদে, ঝড়বৃষ্টিতে সব রকমের কায়িক শ্রমও বাদ যেত না। খাবার ছিল জঘন্য। সবচেয়ে অসহ্য — কথায় কথায় চড়চাপড়, লাথি ঘুসি আর বেত্রাঘাত। মাঝে মাঝে শাস্তি হিসেবে রোদের মধ্যে মাথা দিয়ে নীচে পা ওপরে করে ঝুলিয়ে রাখত। ভদ্রলোক ত বাঁচার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। জাপানিদের বর্মা ছেড়ে পালাতে না হলে উনি হয়ত মারাই যেতেন বলে ওঁর ধারণা। এ সব শুনে তখন বড়োরা অনেকে বলাবলি করত, ভাগ্যিস জাপানিরা হেরে গিয়েছিল। তা না হলে তারা যদি ভারতবর্ষ দখল করে নিত, তাহলে আমাদের দুরবস্থার সীমা থাকত না। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এ ধারণা কতটা যুক্তিযুক্ত তা অবশ্য বলা যায় না।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। সব ভারতীয়রা যখন রেঙ্গুন ছেড়ে পালাচ্ছে, তখন একটি ছোট মেয়ে আর তার মা শেষ ষ্টিমারে উঠতে পারেনি। পায়ে হেঁটে তারা কোনওরকমে অজানা অচেনা কলকাতায় পৌছুন। এ ছোট মেয়েটি পরে হিন্দি ছবির প্রখ্যাত অভিনেত্রী ও নর্তকী হন— নাম হেলেন।

সুলতানপুরের গ্রামে এসে খুব একটা খারাপ লাগছিল বলে মনে পড়ে না। শহর এবং গ্রামের মধ্যে তফাতটা বোঝার মতো বয়স তখনও হয়নি বলে বোধহয়। তাছাড়া আকিয়াব ছিল ছোট্ট শহর, প্রায় গ্রামের মতোই। খারাপ না লাগার একটা কারণ হয়তো গ্রামে দস্যিপনা করার সুযোগ ছিল অনেক বেশি। মাঠঘাট, গাছগাছড়া, খালবিল, পুকুর সব মিলে বেশ ভালোই লাগত। তাছাড়া এখানে ছিল একান্নবর্তী পরিবার। খুড়তুতো ভাইবোন ছিল বেশ

কয়েকজন— পাড়াতেও সমবয়সির অভাব ছিল না। সবাই মিলে খুব হৈ হল্লোড় করা যেত। কত রকমের ফলের গাছ যে ছিল— আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বাতাবি, কুল, আরও কত কী। বনেজঙ্গলে, নিজেদের এবং অন্যদের বাড়ি থেকে কুল আর পেয়ারা পাড়াটা আমার একটা নেশার মতো হয়ে গেছিল। আরেকটা নেশা ছিল আমের দিনে খুব ভোরে উঠে আম কুড়োতে যাওয়া। রাত্রে প্রায় ঘুমই হত না— কখন ভোর হবে, আর অন্যরা ওঠার আগে কী করে আমবাগানে ছুটে যাব সে ভাবনায়।

বাবারা দু'ভাই, সৎভাই আরও তিনজন। বাবার ছোটো ভাই ডাক্তার, তিনি গ্রামেই থাকতেন। ডাক্তারি ছাড়াও তিনি জমিজমা, চাষবাসের দেখাশোনা করতেন। বাবা আর তিন সৎভাই বর্মায় থাকতেন। দুভাই ব্যবসা করতেন, বাবা আর সবচেয়ে ছোটো ভাই সরকারি চাকরি করতেন। সবাই এখন দেশের বাড়িতে ফলে সুলতানপুরের বাড়িতে প্রচুর লোকজন। জমিজমা আমাদের মোটামুটি ভালোই ছিল— তবে জমিদারি মোটেই নয়। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা অনেকেই ওখানে জমিদার ছিলেন বলে দাবি করতেন শুনেছি। আমাদের কিন্তু তা করার কোনো অধিকার ছিল না— করলে হাস্যকর হত। তবে আশ্চর্য্য আমাদেরও কিন্তু কয়েকঘর মুসলমান প্রজা ছিল, বছর বছর তারা খাজনা বাবদ কিছু কিছু ধান (খুব বেশি পরিমাণ অবশ্যই নয়) দিয়ে যেত। আমাদের পাড়ার পরে দু'তিনটে পুকুর, তারপর কিছুটা ধানজমি, তারপরেই ছিল এই কয়েকটি পরিবারের বাস।

দেশে ফিরে আসার পর অন্য কাকারাও ডাক্তারকাকার সঙ্গে চাষবাসের ব্যাপারটা দেখতেন কিছুটা। বাবা কিন্তু এবিষয়ে কোনোদিনই উৎসাহী ছিলেন না, বিশেষ কিছু জানতেন ও না। তাই ও নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। দু'একজন মুনিষ প্রায় সারা বছরই বাড়িতে থাকত আর যখন চাষের কাজ বেশি হত, তখন আরও দু'চারজনকেও লাগাতে হত। মাঝে মাঝে এসব মুনিষদের জন্য আমাদের মতো ছোটোদের দুপুরের খাবার—ডাল,ভাত, তরকারি, কখনও বা মাছ—নিয়ে যেতে হত। জলকাদার মধ্য দিয়ে মাঠে যেতে খুব খারাপ অবশ্য লাগত না। শুধু কখনো সখনো পা পিছলে পপাত ধরণীতলে, জলকাদায় একাকার। ফিরে এসে পুকুরে ডুব দিয়ে কিছুটা ভদ্রস্থ হতে হত।

গ্রামের স্কুলেই ভরতি হলাম আমি, প্রাইমারি স্কুল, ক্লাস সিক্স অবধি ছিল। বাড়ি থেকে স্কুল মিনিট পনেরো কুড়ির রাস্তা। স্কুলে যেতে যেতে যথারীতি অনেক রকমের দুষ্টুমি করা হত। মনে আছে, ক্লাস থ্রি বা ফোর হবে বোধহয়— টিফিনের সময় কয়েকজন মিলে বড়ো রাস্তা পেরিয়ে একটা বাড়িতে যেতাম। টিফিনের ব্রেক ছিল, সব স্কুলে যেমন থাকে কিন্তু টিফিনে স্কুলে কিছু নিয়ে যেতাম বা খেতাম বলে মনে পড়ে না। সকালে ভাত খেয়ে যেতাম, ফিরে এসে সাধারণত আবার ভাতই খেতাম, কদাচিৎ মুড়ি। তবে টিফিনের সময় সেই বাড়িতে যাওয়ার একটা কারণ ছিল— শুধু আমি ছাড়া সেখানে আমার সঙ্গীদের চার/পাঁচ জন সবাই হুঁকো খেত। আমি শুধু এদের সঙ্গ দিতে যেতাম।

এখনও ভাবতে অবাক লাগে সঙ্গীরা সবাই তামাক খেত (হুঁকো খাওয়াটাকে তখন তামাক

খাওয়া বলা হত), আমি কেন খেতাম না জানি না। হয়তো মনের কোথাও একটা বোধ ছিল যে 'ভালো ছেলেরা' তামাক খায় না। আরও একটা কারণ ছিল। একবার আমাদের বাড়িতে কলেজের ছাত্র এক আত্মীয় এসে চেয়ারে বসে চুপি চুপি সিগারেট ধরাল। আর ঠিক তখনই ডাক্তারকাকা হাঁক দিয়ে ওকে ডাকলেন। এই কাকাকে সবাই বাঘের মতো ভয় করত। সেই বেচারি জ্বলন্ত সিগারেট ফেলে দৌড় দিল। আমি ওখানে ছিলাম— সিগারেটটা তুলে নিয়ে বেশ লম্বা একটা টান দিলাম। মুখটা কেমন বিস্বাদ হয়ে গেল আর মাথাটাও ঘুরে গেল। সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিস্তার। তারপর যে কোনোদিন আবার ধূমপান করব তা চিন্তাই করতে পারিনি। 'ভালো ছেলে' থেকে 'খারাপে' পরিণত হওয়া ঘটেছিল যদিও অনেক পরে— এবং আশ্চর্য্যজনকভাবে ছাত্রাবস্থায় নয়, ছাত্র ঠ্যাঙাতে শুরু করার পর। অর্থাৎ কিছুটা বৃদ্ধবয়সেই। তাই বোধহয় বদ অভ্যাসটা আজও ছাড়তে পারিনি।

ধূমপান নিয়ে ছোটোবেলার কিছু মজার ব্যাপার বেশ মনে আছে। কল্কেতে তামাক ভরে টিকাতে আগুন দেওয়ার পর সাধারণত বাড়ির বড়ো বউকে হুঁকোতে কয়েক টান দিয়ে তামাকটা ধরিয়ে দিতে হত। তারপর ডাক্তারকাকা সেটা টানতেন। তার মানে প্রাথমিক কাজটা বউদেরই করতে হত। তাতে অনেক সময় বাড়ির বউদেরও হুঁকো খাওয়া কিছুটা অভ্যেস হয়ে যেত। সবচেয়ে মজা লাগত, অন্য কাকারা বা ডাক্তারকাকার চেয়ে বয়সে ছোটো কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব কেউ এলে তারা ডাক্তারকাকার সামনে হুঁকো খেতেন—তবে ডাক্তারকাকার দিকে পেছন ফিরে। অর্থাৎ ঠিক চোখের সামনে বা মুখোমুখি বসে নয়। বাড়ির চাকরবাকর বা মুনিষদের জন্য আলাদা হুঁকো থাকত। মুসলমান প্রজাদের মধ্যে কেউ এলে তাদের জন্যও আলাদা হুঁকো ছিল। লোকজন বাড়িতে এলে আপ্যায়নের অঙ্গ হিসেবে হুঁকোতে তামাক সেজে তাদের দেওয়াটা ছিল রেওয়াজ।

বর্মা থেকে ফিরে এসে বাবাকে বেশিদিন গ্রামে থাকতে হয়নি। আসার কিছুদিন পরেই আকিয়াবের অফিস সিমলাতে চালু হয়ে গেল এবং বাবাকে সিমলায় ডেকে পাঠান হল। পরিবারের সবাইকে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না— কারণ এটা যুদ্ধকালীন সাময়িক ব্যবস্থা। তাই আমাদের গ্রামেই থাকতে হল। গ্রামে খুব একটা খারাপ ছিলাম বলে মনে পড়ে না। অবস্থা আমাদের মোটামুটি স্বচ্ছলই ছিল। জমিজমা যা ছিল তাতে চলে যাওয়ার কথা। তাছাড়া বর্মা থেকে ফিরে এসে মার একটা লাইফ ইনসিওরেন্স ম্যাচিওর করেছিল। সে টাকা দিয়ে বেশ কিছুটা ধানের জমি কেনা হয়েছিল। অনেকগুলো জমিই ছিল দু'তিন ফসলি। তাই ধান ছাড়াও নানারকম রবিশস্য, শাকসব্জি এসবও ভালোই হত। পুকুর ছিল গোটা তিনেক, অবশ্য এজমালি। তাতে মাঝে মধ্যেই মাছ ধরা হত। পুকুরে বড়ো জাল দিয়ে যেদিন মাছ ধরা হত সেদিন আমাদের উত্তেজনার সীমা থাকত না। এই জালে প্রায়ই বেশ বড়ো বড়ো মাছ ধরা পড়ত— পাঁচ/ছয় কেজিরও বেশি ওজন একেকটার। দু'তিন শরিকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার পরেও আমাদের ভাগে ভালো রকমের মাছই থাকত। ক'দিন মহানন্দে ভোজ চলত। তাছাড়া মাঝেমধ্যেই কাকারা বা চাকরদের মধ্যে কেউ পুকুরে জাল ফেলে নানারকমের